Sailajananda Falguni Smriti Mahavidyalaya

Dept. of History

Teacher's name - Prof.Prabir Mukhopadhyay

Study materials for B.A 4th sem students

Scanned with CamScanner

উঃ ২০০০ এর ৩। (খ) প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রঃ (ঘ) সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে লর্ড ডালহৌসীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উঃ Innes লর্ড ডালহৌসীর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির প্রধান বিষয় ছিল রাজ্য অধিগ্রহণ করা।" ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে লর্ড ডালহৌসী প্রধানত তিনটি উপায়ে বিভিন্ন রাজ্য অধিকার করেছিলেন। এই তিনটি উপায় ছিল—(১) যুদ্ধের সাহায্যে রাজ্য অধিগ্রহণ, (২) স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে দেশীয় রাজ্য অধিগ্রহণ, (৩) কুশাসনের অজুহাত দিয়ে মিত্ররাজ্য অধিগ্রহণ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে যে সমস্ত অঞ্চল তিনি দখল করেছিলেন সেগুলি হল (১) দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের (১৮৪৮-৪৯ খ্রিঃ) পর পাঞ্জাবে কোম্পানীর আধিপত্য স্থাপিত হয়, (২) ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে সিকিমের তরাই এবং তিস্তা নদীর সংলগ্ন অঞ্চল, তিনি দখল করেছিলেন, (৩) ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধের পর ডালহৌসী নিম্ন বার্মা (পেগু) দখল করেন, (৪) ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে বেরার দখল করেছিলেন। (৫) স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা ডালহৌসী সাতারা (১৮৪৮), জৌৎপুর, সম্বলপুর (১৮৪৯), বাঘাট (১৮৫০), উদয়পুর

Scanned with CamScanner

প্রঃ (ঙ) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

উঃ ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তি আফগান আহম্মদ শাহ আবদালির কাছে পরাজিত হলে মারাঠা শক্তি সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। প্রথম মাধব রাও-এর সময়ে ১৭৬২-১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া মাধব রাওয়ের মৃত্যুর ফলে মারাঠাদের নেতৃত্ব দেবার কেউ ছিল না। ফলে মারাঠাদের এই দুর্বল অবস্থায় ইংরেজ শক্তি মারাঠা শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনা হয়।

Grant Duff 'History of the Marathas' গ্রন্থে বলেন, 'পেশোয়া বংশে দ্বন্দ্ব থেকেই নারায়ণ রাওকে হত্যা করা হয় এবং রঘুনাথ রাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন।" মারাঠা নেতৃবৃন্দও ক্ষুব্ধ হন। তারা রঘুনাথ রাওকে বিতাড়িত করে নাবালক মাধব রাও নারায়ণকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। রঘুনাথ রাও বোম্বাইয়ের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিয়ে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে সুরাটের সন্ধি করেছিলেন। যার ফলে ইংরেজরা মারাঠাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনা হয়।

মারাঠাদের গৃহবিবাদে কোম্পানীর হস্তক্ষেপ করার ফলেই প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনা

Scanned with CamScanner

কুশাসনের অভিযোগে তিনি অযোধ্যা দখল করেছিলেন।

লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮-৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল অধিগ্রহণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে লর্ড ডালহৌসীর কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের পর লর্ড ডালহৌসী পাঞ্জাব দখলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ডালহৌসীর অধিগ্রহণ নীতিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন হেনরী লরেন্স এবং এডওয়ার্ড কিউরী প্রমুখরা। ডালহৌসীর পাঞ্জাব দখলের নীতিকে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। Evans Bell তার "The Annexation of Punjab" গ্রন্থে বলেছেন যে, 'পাঞ্জাব অধিগ্রহণ ছিল পবিত্র প্রতিশ্রুতি ভাঙার একটি বেদনাদায়ক নজীর।"

ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের নজির পাওয়া যায় স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা। স্বত্ববিলোপ নীতির সাহায্যে যে রাজ্য ব্রিটিশদের উপর নির্ভরশীল সেই রাজ্যে রাজার সন্তান না হলে রাজাকে দত্তক গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। রাজার মৃত্যুর পর সেই রাজ্য কোম্পানী অধিগ্রহণ করবে। ডালহৌসী স্বত্ববিলোপ নীতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা হায়দ্রাবাদ রাজ্য, সাতার, নাগপুর, সম্বলপুর, ঝাঁসী প্রভৃতি রাজ্য দখল করেছিলেন।

লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের অন্যতম নজির ছিল কুশাসনের অজুহাতে রাজ্য গ্রহণ। অযোধ্যার নবাবের উপর কোম্পানী বিভিন্ন সন্ধি চাপিয়ে দিয়েছিল। অযোধ্যায় নবাবের শাসনের দায়িত্ব থাকলেও কোম্পানীর কর্মচারী ও ইংরেজ বণিকরা অযোধ্যায় বিভিন্ন শোষণকার্য চালাত। অযোধ্যার কুশাসন সম্পর্কে প্রতিবেদনের জন্য কর্নেল শ্লীম্যানকে নিয়োগ করা হয়। শ্লীম্যানের প্রতিবেদন পেয়ে লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে পদচ্যুত করে অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ করেন। অযোধ্যা অধিগ্রহণের বিষয়টিকে সমালোচনা করা হয়েছে। কুশাসনের অজুহাতে রাজ্যগ্রহণের নীতি গ্রহণ করার ফলেই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

William Lee-Warner তাঁর "Life of Dalhousie" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে লর্ড ডালহৌসীকে ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড ওয়েলেসলির সমতুল্য বলে মনে করেছেন। স্যার উইলিয়ম হান্টারও বলেছেন, 'লর্ড ডালহৌসী সাম্রাজ্য বিস্তার, সংহতি স্থাপন এবং সুশাসন ও সংস্কারের দ্বারা আধুনিক ভারতের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।" লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবিস্তার নীতির মধ্যে নীতিহীনতাই বেশী ছিল। Richard Temple লর্ড ডালহৌসীকে সাম্রাজ্যবাদী এক শাসক হিসেবেই অভিহিত করে বলেন যে, "সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে লর্ড ডালহৌসীর সমতুল্য কেউ হলেও তাকে কেউই অতিক্রম করতে পারেননি।" যদিও লর্ড ডালহৌসীর সংস্কার নীতিগুলির মধ্যে রেলপথ ব্যবস্থার স্থাপন, ডাক বিভাগের সংস্কার, প্রভৃতি ছিল প্রশংসার যোগ্য, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে তার স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের পরিচয়ও ছিল উল্লেখযোগ্য। মার্সম্যান স্বভাবত এই কারণেই লর্ড ডালহৌসীকে 'আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরাচারী' বলে অভিহিত করেছেন।

Scanned with CamScanner

পেতে ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ইংরেজ
সন্দেহ হওয়ায় ক্লাইভ ১৭৫৯ খ্রিঃ বিদেরার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করেন। মীরজাফ
সরিয়ে মীরকাশিমকে নবাব করা হয়। মীরকাশিমও ইংরেজদের প্রচুর অর্থ ও কয়েকটি জে
দান করেন, কিন্তু তিনিও তাদের উপর বিরক্ত হন।

যুদ্ধ ১৭৬৪ ঃ মীরকাশিম স্বাধীনচেতা ছিলেন তাই তিনি ইংরেজদের অধীনতা মানতে র
ছিলেন না তিনি আয় বৃদ্ধি করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকেন। ইংরেজ প্রভাব থেকে
মুঙ্গেরে রাজধানী নিয়ে যান, বিদেশী সেনাপতির সাহায্যে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে থাকে
আগে থেকে ইংরেজ কোম্পানি বাণিজ্যের অধিকারের অপব্যবহার করত। মীরকাশিম ভার
বণিকদেরও বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দিলে তার সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য হয়ে প
ইংরেজ সৈন্য পাটনা দখল করলে যুদ্ধ শুরু হয়। মীরকাশিম পর পর কাটোয়া, ঘোরিয়
উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হন। তিনি অযোধ্যার নবাব ও দ্বিতীয় শাহ আলমের সাহায্য চ
১৭৬৪ খ্রিঃ এই তিন মিলিত বাহিনীর সঙ্গে বক্সারে ইংরেজদের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয় তা
মীরকাশিম পরাস্ত হন ও পলায়ন করেন।

ফল ঃ বক্সার যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়ের ফলে এলাহাবাদ পর্যন্ত পূর্ব ভারতের স
অংশ ইংরেজদের অধিকারে আসে। পলাশির জয়লাভে যে আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল বক্স
যুদ্ধে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হল। নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ইংরেজদের আর দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়
এই যুদ্ধে পরাজয়েই প্রমাণিত হল বাংলার শাসন ও সামরিক শক্তির আর কিছুই অবশিষ্ট

● **প্রশ্ন ঃ** ইংরেজরা

Scanned with CamScanner

মাধ্যমেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হলে একাজ দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

১৭৮০ খ্রিঃ জেমস অগাস্টাস হিকি সাপ্তাহিক বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করেন, সরকারি কাজে দুর্নীতি প্রকাশে এই ইংরাজি সাপ্তাহিকটি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। কয়েক বছরের মধ্যে আরও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়—ইন্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, হরকরা। মাদ্রাজেও ইন্ডিয়া হেরাল্ড, মাদ্রাজ কেরিয়ার প্রকাশিত হয় (১৮১৯ খ্রিঃ)। বোম্বাই থেকেও বোম্বে হেরাল্ড, বোম্বে গেজেট প্রকাশিত হয়। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক দোষ তুলে ধরাই ছিল হিন্দু কলেজের ছাত্রদের 'পার্থেনান'-এর উদ্দেশ্য।

বাংলাভাষাতেও বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনারীদের দিগ্‌দর্শন এই সময় প্রকাশিত হয় (১৮১৮ খ্রিঃ), বাংলাতে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের বাংলা গেজেট ঐ সময়কার পত্রিকা, সমাচার দর্পণ, সংবাদ কৌমুদি (১৮২১ খ্রিঃ), সমাচার চন্দ্রিকা একই সময় প্রকাশিত হয়। এইসব পত্রিকা মারফৎ তদকালীন সমাজের চিত্র জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ খ্রিঃ ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ইয়ং বেঙ্গলের জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞান সেবধি ও অক্ষয় দত্তের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করা হয় (১৮৪৩ খ্রিঃ)। এইসব পত্রিকা বন্ধের জন্য যে আইন জারি হয় তা ১৮৩৫ খ্রিঃ প্রত্যাহৃত হয়। মহাবিদ্রোহের পূর্বে এইসব পত্রিকা স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের জাতীয় চেতনার উন্মেষে এদের দান অসীম।

Scanned with CamScanner

বেঙ্গল গেজেট ১৭৮০ খ্রিঃ ঃ ১৭৮০ খ্রিঃ এক স্বাধীনচেতা ইংরেজ জেমস অগাস্টা... 'দি বেঙ্গল গেজেট' নামে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, কিন্তু সরকারের দুর্নীতি প্রকা... জন্যে তা শীঘ্র বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হয় (১৭৮২ খ্রিঃ)। ভারতীয়দের দ্বারা পরি... সংবাদপত্রের প্রকাশ শুরু হয় ১৮০০ খ্রিঃ প্রথম থেকেই।

নব্যবঙ্গ আন্দোলনের নেতারা কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ১৮৩১ খ্রিঃ মধ্যে...

হরিশচন্দ্র মুখো: ১৮৫৩ খ্রিঃ ঃ এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (East Indian, Ind... Indian Reformer, Hindu Pioneer, Bengal Spectator) প্রভৃতি। হরিশচন্দ্র মুখো... (Hindu Patriot) (১৮৫৩ খ্রিঃ) সংবাদিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন সমালোচনামূলক ও পরি... মনোভাব সাংবাদিকদের প্রভাবিত করে।

ভারতীয় মালিকানায় ইংরাজি পত্রিকা ঃ ভারতীয় মালিকানায় ইংরাজি পত্রিকাগুলির... ইন্ডিয়ান মিরার, লাহোর ট্রিবিউন, বেঙ্গলী, ইন্ডিয়ান হেরাল্ড, মারাঠা, ইন্দুপ্রকাশ, অমৃত... ইন্ডিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬১ খ্রিঃ ভারতীয় কাউন্সিল আইন ভারতে সাংবাদি... ক্ষেত্রে বিশেষ স্মরণীয়।

দেশীয় ভাষায় পত্রিকা ঃ দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সোমপ্রকাশ, শিক্ষাদর্পণ, সংবাদ... ভারতমিহির, বঙ্গদর্শন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশিরকুমার ঘোষের অমৃত বাজার পত্রিকা (১... খ্রিঃ) উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবি রাখে। উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের ক্ষেত্রে কেশব সেনের সু... সমাচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সংবাদপত্রের নির্ভীক সমালোচনা ইংরেজ সরকারকে ভীত করায় ১৮৭৮ খ্রিঃ লর্ড লি... 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' প্রবর্তন করেন। এই আইনে সরকার-বিরোধী বা প্ররোচনামূলক সং... প্রকাশ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, আদেশ অমান্য করলে সংবাদপত্র ও মুদ্রণযন্ত্র বাজেয়া... করার অধিকার সরকারের হাতে থাকে। দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয় আইন পাশ হ... অমৃত বাজার পত্রিকা ইংরাজিতে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৮২ খ্রিঃ লর্ড রিপণ এই আ... বাতিল করলে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা শিথিল হয়। ইতিমধ্যে বেশ কিছু সংবাদপত্র জাতীয়তাবাদ প্র... শুরু করে।

গুরুত্ব ঃ এ যুগের সংবাদপত্রসমূহ জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনায় বিশেষ... প্রভাব বিস্তার করে। সরকারি নীতি ও ভারতের সম্পদ লুণ্ঠনের নানা সংবাদ প্রকাশিত হ... থাকে। বিংশ শতাব্দীর বহু আগে থেকেই জাতীয়তাবাদ প্রচারের ফলে আন্দোলন নতু... লাভ করে। বন্দেমাতরম, যুগান্তর, মডার্ন রিভিউ, প্রবাসী জাতীয় জীবনে ও জনমানসে ন... জোয়ার নিয়ে আসে। এইভাবে ভারতের সংবাদপত্র সারা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোল... শক্তি সঞ্চারে সাহায্য করে।

● **প্রশ্ন ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে পত্রপত্রিকার বিকাশ ও তার অগ্রগতির সং...** বিবরণ দাও।

○ **উত্তর ঃ** পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার শুরু হবার সময় থেকেই ভারতে পত্রপত্রিকার বি... লক্ষ্য করা যায় যা জাতীয় চেতনাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে থাকে। এইসব পত্রপ...

Scanned with CamScanner

উদ্দেশ্য ঃ (i) ভারতীয় প্রশাসনের কেন্দ্রীকরণ করা। (ii) ভারতীয় কোম্পানির কা... নিয়ন্ত্রণ করা। এই আইন অনুসারে ভারতে কোম্পানির প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত... হেস্টিংস এবং ১৭৭৪ খ্রিঃ কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রথম প্রধান বিচার... স্যার এলিজা ইম্পে।

(2) **১৭৮৪ পিটের ভারত শাসন আইন ঃ** ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিটের নামানুসারে ১৭... খ্রিঃ ভারত শাসন আইন পাশ হয়। এই আইন দ্বারা (i) গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা... পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, (ii) বোম্বে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উপর কলকাতা প্রেসিডে... নিয়ন্ত্রণ সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় করা হয়।

(3) **১৭৯৩ সনদ আইন ঃ** কর্ণওয়ালিশের আমলে এই আইনটি পাশ হয়। এর দ্বারা গ... জেনারেলের ক্ষমতা ও অন্যান্য দুটি প্রেসিডেন্সির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরো বৃদ্ধি পায়।

(4) **১৮১৩ খ্রিঃ চার্টার আইন ঃ** এই আইন দ্বারা (i) ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ব... করার একচেটিয়া অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, (ii) এখন থেকে সমস্ত বিদেশি বণিক ভা... ব্যবসা করার পূর্ণ অধিকার পায়, (iii) কোম্পানিকে ভারতীয়দের শিক্ষার উন্নতির জন্য ১... টাকা ব্যয় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

(5) **১৮৩৩ খ্রিঃ চার্টার আইন ঃ** এই আইন দ্বারা (i) কোম্পানিকে আরো কুড়ি... ভারতে শাসন পরিচালনা করবার অধিকার দেওয়া হয়, (ii) কোম্পানিকে বাণিজ্যিক প্রতি... হিসেবে কাজ করবার অধিকার বিলুপ্ত করা হয়।

(6) **১৮৫৩ খ্রিঃ চার্টার আইন ঃ** এই আইন দ্বারা (i) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার... সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। (ii) বাংলা, বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি... লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদ সৃষ্টি হয়।

● **প্রশ্ন ঃ মুর্শিদকুলি খাঁর ভূমিরাজস্বব্যবস্থা কেমন ছিল? 'মালজামিনি' প্রথা কী?**

○ **উত্তর ঃ** ১৭০০ খ্রিঃ মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাংলায় দেওয়ান হয়ে আসেন তখন ... মালিকানাধীন জমি ছিল দুধরনের (i) খলিসা (ii) জায়গির। এই সমস্ত জমির উপরই ... ভূমিরাজস্বব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু মুর্শিদকুলির আগমনের পূর্বে ভূমিব্যবস্থা থেকে সর... বিশেষ আয় হত না।

মুর্শিদকুলি রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য দুটি নীতি নেন। (i) মোঘল কর্মচারীদের সমুদয় জমি খা... পরিণত করা এবং তাদের ওড়িশায় জঙ্গলাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে জায়গির দেওয়া। (ii) ... আদায়ের দায়িত্ব জমিদারদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ইজারাদারদের হাতে ন্যস্ত কর... নবপ্রবর্তিত রাজস্বব্যবস্থা 'মালজামিনি' নামে পরিচিত।

মুর্শিদকুলি প্রদেশের সমস্ত আবাদী ও অনাবাদী জমি জরিপ করে জমির উৎপাদি... অনুসারে রাজস্বের পরিমাণ ধার্য করেন। জমির বিবরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের নাম... রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখ থাকত। ১৭২২ খ্রিঃ তিনি শাহসুজার (১৬৫৮) রাজস্ব ব্যব... আমূল পরিবর্তন করেন। প্রতিটি পরগণা তিনি ১০টি 'চাকলায়' বিভক্ত করেন। প্রতিটি... (অঞ্চল) ছিল প্রশাসনিক কাঠামোর একটি মূল্যবান একক (unit)। আমিল নামধারী ক... ছিলেন 'চাকলা'র রাজস্ব সংগ্রাহক। ভূমিরাজস্ব থেকে তাঁর মোট আয় হয় ১.৫ কোটি ... ফলে বাংলার কোষাগার সমৃদ্ধ হয়।

Scanned with CamScanner

(vii)

● **প্রশ্ন ঃ 'অধীনতামূলক' মিত্রতা নীতি সম্বন্ধে টীকা লেখো। এর শর্তগুলি কী ছিল? এই নীতি প্রথম কে গ্রহণ করেন?**

○ **উত্তর ঃ** নেপোলিয়নের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতকে ফরাসি প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সরাসরি হস্তক্ষেপ নীতি নেয়। এই নীতি লর্ড ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি নামে খ্যাত। এই নীতির মূল বিষয়বস্তু ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গকে ইংরেজদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ করা ও বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। এর শর্তগুলি হল—

(i) দেশীয় রাজাদের কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করতে হবে এবং কোনো দেশীয় রাজা ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে অন্য কোনো রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা বা মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে না।

(ii) শক্তিশালী দেশীয় নৃপতির নিজস্ব সৈন্যবাহিনীতে ইংরেজ সেনাপতি নিযুক্ত করতে হবে।

(iii) মিত্রতা গ্রহণকারী রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব যেহেতু কোম্পানির সেহেতু সৈন্যবাহিনীর খরচের জন্য নির্দিষ্ট রাজ্যাংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে হবে।

এই নীতি প্রথম গ্রহণ করেন হায়দ্রাবাদের নিজাম, ১৭৯৮ খ্রিঃ।

Scanned with CamScanner

পরাশর সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন যে, হিন্দু শাস্ত্রগুলিতে বিধবা বিবাহের সমর্থন রয়েছে। ড. অমলেশ ত্রিপাঠী এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের আন্দোলন ছিল না, ছিল সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলনের ঢেউ বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিধবাবিবাহের পক্ষে সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। অবশেষে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫নং রেগুলেশনের সাহায্যে সরকার বিধবা বিবাহকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর এরপর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিধবা কালীমতি দেবী এবং নিজের পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে বিধবা ভবসুন্দরীর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। নারীমুক্তি আন্দোলনের সফলতা এখানেই যে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পেয়েছিল।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদাসাগরের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পুরুষদের বহু বিবাহকে তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেন নি। বিদ্যাসাগর বর্ধমানের মহারাজার সাহায্য পেয়েছিলেন বহু বিবাহের বিরোধিতার ক্ষেত্রে। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন। বহু বিবাহের কুফল সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করাই ছিল বিদ্যাসাগরের মূল লক্ষ্য। দরিদ্র বিধবাদের সাহায্যে তিনি 'হিন্দু এ্যানুয়িটি ফান্ড'' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার 'সুরাপান নিবারণী সমিতি' স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সুরাপানের কুফল উল্লেখ করে তা বন্ধের জন্য প্রচার চালিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, বিদ্যাসাগর গণশিক্ষার আদর্শ সকলের সামনে তুলে ধরেন। সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা করেন। বর্তমানে বাংলা শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বর্ণপরিচয়' প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে চালু রয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে 'ইঙ্গ-সংস্কৃত' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ তাকে বহু বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন। কলকাতার 'মেট্রোপলিট্যান ইনস্টিটিউশন' বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় অধ্যাপকরা ইংরেজ অধ্যাপকদের সঙ্গে তুলনায় উচ্চমানের শিক্ষা দিতে সক্ষম বলে তিনি মনে করতেন। বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে বিদ্যাসাগর বহু ছাত্রীকে এই স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। গ্রামাঞ্চলেও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রায় ৩০টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর শিক্ষাগত ক্ষেত্রে অবদান তো রেখেছিলেন, অন্যদিকে সংস্কারক ও মানবতাবাদী হিসাবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তাই জেলেপাড়ার অশিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তিরাও গান করেছেন, "বেঁচে থাকো বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে...।" শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও মানবতাবাদীরূপে বিদ্যাসাগর সমান গুণের অধিকারী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদাবোধও ছিল প্রবল। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কোন স্বার্থ ছিল না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতে, "প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিদের মতো প্রতিভা ও বোধশক্তি এবং ইংরেজদের মতো উদ্যম ও কর্মশক্তি ছাড়াও বাঙালী মায়ের মতো কোমল হৃদয় বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

বলে মনে করেছিলেন।
-মহীশূর সম্পর্কে চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছিল। সাময়িক যুদ্ধবিরতি হিসাবে ইংরেজ ও মহীশূরের মধ্যে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ভেঙে উভয় পক্ষই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। যার ফলশ্রুতি হল তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে টিপু সুলতান ইংরেজদের মিত্ররাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করেছিল যার ফলে, তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং মারাঠা পক্ষ ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করেছিল। ১৭৯০ থেকে ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ চলেছিল। শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের এই মিলিত জোটের কাছে টিপু সুলতানকে হার মানতে হয়। ইংরেজরা তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বিশেষভাবে লাভবান হয়েছিল।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূরের যুদ্ধের ফলাফল হিসাবে বলা যেতে পারে ইংরেজরা টিপু সুলতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনম দখল করেছিল। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনমের সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল টিপু সুলতান ও ইংরেজদের মধ্যে। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা কতকগুলি স্থান নিজেদের অধিকারে এনেছিল। শ্রীরঙ্গপত্তনমের সন্ধির দ্বারা টিপু সুলতান তার রাজ্যের অর্ধেক অংশই ইংরেজদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম, মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে টিপু সুলতানের অর্ধেক রাজ্য ভাগ হয়ে যায়। টিপু সুলতান ইংরেজদের ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়েছিলেন যার ফলে দেখা যায় তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের দ্বারা ইংরেজরা তাদের ক্ষমতা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল।

প্রঃ (চ) 'অবশিল্পায়ন' বলতে তুমি কী বোঝ?

উঃ 'অবশিল্পায়ন' এর সংজ্ঞা দিয়েছেন সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর 'ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি' গ্রন্থে। তাঁর মতে, "অবশিল্পায়ন হল শিল্পের বিপরীত অবস্থা। রাষ্ট্রের জনসাধারণ যদি শিল্প ছেড়ে কৃষির দ্বারা জীবিকা অর্জন করে অথবা জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কৃষিজ অংশ বাড়তে থাকে একেই অবশিল্পায়ন বলা হয়। অর্থনীতিবিদ রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, 'ব্রিটিশ সরকার ভারতের উৎপাদকদের প্রতি অবহেলা করার ফলে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস হয়।" ভারতীয় শিল্পের এই ধ্বংস সাধনকেই সাধারণ অর্থে অবশিল্পায়ন বলা হয়ে থাকে।

Hamilton তাঁর "Relations between England and India" গ্রন্থে অবশিল্পায়নের জন্য ব্রিটিশ সরকার দায়ী নয় বলে মনে করেন। তাঁর মতে, যন্ত্রচালিত সস্তা ও উন্নতমানের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হস্তশিল্প ভেঙে পড়েছিল। মহাদেব গোবিন্দ রানাডে বলেন, ভারতীয়রা সূতীবস্ত্র তৈরি করে নিজেদের চাহিদা মেটাত। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে ইংরেজরাই কাপড়ের যোগান দিয়েছিল। ফলে ভারতবাসী সম্পূর্ণভাবে অসহায় ও অন্যদের

Scanned with CamScanner

ছিল না। ইংরেজরা তাঁকে পরাজিত করার জন্যে যে জোট গড়ে তুলেছিলেন তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটে।

● **প্রশ্ন ঃ মারাঠা রাজ্যের পতনের কারণ কী?**

○ **উত্তর ঃ** (১) শিবাজীর চেষ্টায় যে মারাঠা রাজ্য গড়ে উঠেছিল তা তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে ভেঙ্গে গেলেও আবার গড়ে উঠেছিল এবং তা পেশোয়া মাধব রাওয়ের জন্যে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পরে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এই রাজ্যের পতন ঘটে।

(২) মারাঠা রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা কখনোই ভালো ছিল না, পর্বতময় রুক্ষ দেশে তা সম্ভবও ছিল না। রাজ্যের আয় বলতে ছিল লুণ্ঠনজাত দ্রব্য ও কর আদায় যা ছিল জবরদস্তিমূলক, চৌথ ও সরদেশমুখী। এতে অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী হয় না।

(৩) মাধব রাওয়ের মৃত্যুর পর থেকেই গৃহবিবাদ শুরু হয় ও রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ে। রাজ্যরক্ষার জন্য কোনো সমবেত চেষ্টাও হয় নি।

(৪) আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ-বাহিনীর সঙ্গে পুরাতন গেরিলা যুদ্ধ সম্ভব ছিল না। মারাঠা নেতাদের এ বিষয়ে কোনো আগ্রহও ছিল না।

(৫) রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা ও সংহতি রক্ষার জন্যে কোনো সমবেত প্রচেষ্টা বা নেতৃত্ব না থাকায় ইংরেজ-বাহিনীর হাতে তাদের বারবার পরাজয় হয় বলে মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন হয়।

● **প্রশ্ন ঃ কোম্পানির ভারতের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে সনদ আইন ১৭৯৩ সংক্ষেপে আলোচনা করো।**

○ **উত্তর ঃ** ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানিকে কুড়ি বছরের যে বাণিজ্য অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে শেষ হওয়ার আগে থেকেই আবেদন চলতে থাকে। ঐ সময় ইংল্যান্ডে অবাধ বাণিজ্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কর্ণওয়ালিশ ভারতে বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন ফলে তাঁর অনুমোদনক্রমে কোম্পানিকে আরও কুড়ি বছরের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের এই সনদ আইনে পূর্ববর্তী আইনের কিছু পরিবর্তন করা হয়।

(১) বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সদস্যদের বেতনের ব্যবস্থা করা হয়।

(২) গভর্নর জেনারেলের অনুপস্থিতিতে (বোম্বাই, মাদ্রাজে পরিদর্শনে গেলে) কাউন্সিলে একজন সহসভাপতির ব্যবস্থা করা হয়। বিনা নোটিশে কোম্পানির কর্মচারীকে আদেশ জারির অধিকার গভঃ জেঃ-কে দেওয়া হয়।

(৩) গভঃ জেঃ-কে তার পরিষদের যেকোনো সদস্যকে সহঃ সভাপতি নিযুক্ত করার অধিকার দেওয়া হয়।

(৪) প্রধান সেনাপতিকে গভঃ জেঃ-এর কাউন্সিলের সদস্যপদের জন্যে ডাইরেক্টরসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

Scanned with CamScanner

(vii) ...

● প্রশ্ন ঃ 'অধীনতামূলক' মিত্রতা নীতি সম্বন্ধে টীকা লেখো। এর শর্তগুলি কী ছিল? এই নীতি প্রথম কে গ্রহণ করেন?

○ উত্তর ঃ নেপোলিয়নের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতকে ফরাসি প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সরাসরি হস্তক্ষেপ নীতি নেয়। এই নীতি লর্ড ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি নামে খ্যাত। এই নীতির মূল বিষয়বস্তু ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গকে ইংরেজদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ করা ও বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। এর শর্তগুলি হল—

(i) দেশীয় রাজাদের কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করতে হবে এবং কোনো দেশীয় রাজা ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে অন্য কোনো রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা বা মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে না।

(ii) শক্তিশালী দেশীয় নৃপতির নিজস্ব সৈন্যবাহিনীতে ইংরেজ সেনাপতি নিযুক্ত করতে হবে।

(iii) মিত্রতা গ্রহণকারী রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব যেহেতু কোম্পানির সেহেতু সৈন্যবাহিনীর খরচের জন্য নির্দিষ্ট রাজ্যাংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে হবে।

এই নীতি প্রথম গ্রহণ করেন হায়দ্রাবাদের নিজাম, ১৭৯৮ খ্রিঃ।

Scanned with CamScanner

বাণিজ্যে সবেতেই সংকট দেখা দেয়।

● **প্রশ্ন : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর টীকা লেখো।**

○ **উত্তর : ভূমিকা :** হেস্টিংসের পর কর্ণওয়ালিশ ভারতে এসে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সমাধানের জন্য ১৭৯০ খ্রিঃ 'দশশালা' বন্দোবস্ত এবং পরে এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করা চার্লস গ্রান্ট, জনশোর, ফিলিপ ফ্রান্সিস, থর্নটন প্রমুখের সঙ্গে পরামর্শ করে ও কো ডাইরেক্টরসভার অনুমোদন ক্রমে ১৭৯৩ খ্রিঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দুটি পক্ষ ছিল—(i) সরকার (ব্রিটিশ কোম্পানি) এবং (ii) জ এদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে যে বন্দোবস্ত তাই জমিদারি বন্দোবস্ত বা চিরস্থায়ী ব নামে পরিচিত।

উদ্দেশ্য : কর্ণওয়ালিশের এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল—

(i) রাজস্ব সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা দূর করা।

(ii) ভারতে ইংরেজদের অনুগত একটি অভিজাতশ্রেণী তৈরি করা।

(ii) কৃষকদের সামগ্রিক উন্নতি ঘটানো।

শর্ত :

(i) জমিদারশ্রেণী বংশানুক্রমিকভাবে জমির মালিকানা ভোগ করবেন।

(ii) আদায়ীকৃত রাজস্বে $^{৯}/_{১০}$ অংশ জমিদার কোম্পানিকে দেবে।

(iii) যেকোনো পরিস্থিতিতে রাজস্বের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে।

(iv) বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে রাজস্ব জমা দিতে হবে, অন্যথায় সেই জমি জমি বাজেয়াপ্ত হবে।

ফলাফল বা প্রভাব : সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব বা ফলাফল সুদূরপ্রসারী।

সুফল :

(i) রাজস্বের পরিমাণ ও আদায়ের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়।

(ii) রাজস্বের নিশ্চয়তা সরকারের আয়ব্যয়-এর হিসাব প্রস্তুত করা সহজ হয়।

(iii) সরকারের অনুগত জমিদার তথা অভিজাতশ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

(iv) স্থায়ীভাবে জমির মালিকানা পাবার ফলে জমিদাররা জমির উন্নতির দিকে নজর।

(v) ভূমিরাজস্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবসান হয় এবং সরকারি অর্থের অপচয় বন্ধ

কুফল :

(i) সূর্যাস্ত আইনের জন্য অনেক ভালো জমিদার জমিচ্যুত হয়।

(ii) এই ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়কারী মধ্যস্বত্বভোগীরা লাভবান হয়।

(iii) কৃষকদের উপর অত্যাচার হয়।

(iv) জমির মাপ-জোক না করে জমি দেওয়ার ফলে নানা গন্ডগোল সৃষ্টি হয়।

(v) চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় কোনো পক্ষই জমির উন্নতির দিকে নজর না দেওয়ায় জমির উৎপ ক্ষমতা কমে আসে।

(vi) এই ব্যবস্থায় রাজস্বের হার

Scanned with CamScanner

● **প্রশ্ন ঃ ১৭৫৭-৬৫ খ্রিঃ বাংলায় ইংরেজদের প্রাধান্য বিস্তারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করো।**

○ **উত্তর ঃ** অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে ইংরেজরা নবাবের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে ও নবাব সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এর মূল নায়ক ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ।

নবাব সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের কোনো সময়েই সম্পর্ক ভালো ছিল না। ইংরেজ জানত সিংহাসন নিয়ে নবাবের আত্মীয়দের মধ্যে ষড়যন্ত্র চলছে; তাই তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ও কুঠী নির্মাণ, বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে নবাবের আদেশে কর্ণপাত করত না। বারবার আদেশ অমান্য করায় ১৭৬৫ খ্রিঃ সিরাজ কলিকাতা অধিকার করেন ও ইংরেজদের বিতাড়িত করেন, এই সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছলে ক্লাইভ ও নৌ-সেনাপতি কলিকাতায় এসে কুটনীতিক সাহায্যে শহর পুনরায় অধিকার করেন, সিরাজের সেনাপতি মীরজাফরকে সিংহাসন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্লাইভ নবাবের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রিঃ-র পলাশির যুদ্ধ। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভের ষড়যন্ত্রে বিশাল বাহিনী নিয়েও নবাব পরাজিত ও পরে নিহত হলেন। মীরজাফর বাংলার নবাব হলেন আর ইংরেজরা হল বাংলার ভাগ্যবিধাতা।

বক্সার যুদ্ধ ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ ঃ প্রচুর অর্থ দিয়ে ইংরেজদের সন্তুষ্ট করে মীরজাফর নবাব হলেন বটে, কিন্তু তিনি তাদের অর্থলালসা মেটাতে পারলেন না। তাই ক্রমশ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ওলন্দাজদের সঙ্গে পরামর্শ শুরু করলেন। ক্লাইভের সন্দেহ হওয়ায় ১৭৫৯ খ্রিঃ বিদেরার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরকাশিমকে নবাব করেন। তাঁকেও নবাবী লাভের জন্য প্রচুর অর্থ দিতে হয়েছিল এবং তিনিও ইংরেজদের থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিলেন।

দেওয়ানি লাভ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ঃ মীরকাশিম স্বাধীনচেতা ছিলেন, তাই সৈন্যবাহিনীকে বিদেশী সেনাপতিদের সাহায্যে সুশিক্ষিত করতে লাগালেন ও বাণিজ্যের ব্যাপারে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার সুযোগ দেশীয় বণিকদের দিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। তিনটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নবাব অযোধ্যার নবাব ও বাদশাহের সাহায্য চাইলেন। নবাবের সম্মিলিত বাহিনী ১৭৬৪ খ্রিঃ বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাস্ত হলে মীরকাশিম পলায়ন করলেন। এলাহাবাদ পর্যন্ত ইংরেজ অধিকার বিস্তৃত হল। পলাশির যুদ্ধে যার গোড়াপত্তন হয়েছিল এখন তা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলার সামরিক শক্তি ও শাসনব্যবস্থার স্বরূপ ইংরেজদের কাছে স্পষ্ট হল।

মন্তব্য ঃ ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতে এসে পরাজিত বাদশাহের সঙ্গে এক চুক্তি করলেন—সম্রাটকে এলাহাবাদ ও কোরা জেলা ও বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দেবার শর্তে সম্রাটের কাছ থেকে সন্ধি করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব সংগ্রহ ও দেওয়ানি বিচারের আইনী অধিকার লাভ করলেন। এইভাবে দেওয়ানি লাভ হল। কোম্পানির অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় বাংলার নবাব কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হল, বাদশাহও ইংরেজদের বৃত্তিনির্ভর হয়ে রইল। দেওয়ানি স্বত্ব লাভ করায় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব ব্যাপারে কোম্পানির আধিপত্যের ভিত্তি আরও দৃঢ় হল। এই অধিকারের সুযোগেই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে ইস্ট-ইন্ডিয়া

Scanned with CamScanner

প্রঃ (ঘ) পিট এর ভারত শাসন আইন (১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

উঃ ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিট প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিল। পিট পার্লামেন্টে ভারতে তাদের শাসন সম্পর্কিত একটি বিল নিয়ে এসেছিলেন। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে এই বিল পাশ হলে তাকে পিটের ভারত শাসন আইন বলা হয়।

পিটের ভারত শাসন আইনের শর্তাবলীর দ্বারা কোম্পানীর পরিচালনায় ভিন্ন ধারার নীতি প্রবর্তিত হয়। ভারতে কোম্পানীর শাসন পরিচালনার ব্যাপারেও বিভিন্ন নীতি প্রবর্তন করা হয়। পিটের ভারত রক্ষা আইনের ধারায় ছিল—রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার ইংল্যান্ডের জাতীয় নীতির বিরোধী। কোম্পানী কেবলমাত্র আত্মরক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া যুদ্ধ করতে পারবে না। পিটের ভারত শাসন আইনের দ্বারা ভারতে কোম্পানীর শাসন ও রাজস্ব পরিচালনার যে একচেটিয়া ক্ষমতা ছিল তা লুপ্ত হয়। পরিচালক সভাকে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে বাধ্য করা হয়েছিল। গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বাড়ানো হয়। রেগুলেটিং এ্যাক্টের ত্রুটি পিটের ভারত শাসন আইনের দ্বারা দূর করবার চেষ্টা করা হয়।

পিট কোম্পানীর স্বার্থের দিকটিও দেখেছিলেন। কোম্পানীর কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ব্যাপারে কোন আইন আনা হয়নি। কিন্তু কোম্পানী যা খুশি করতে যাতে না পারে তার জন্য বোর্ড অফ কন্ট্রোলের মাধ্যমে কোম্পানীর উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। পিটের ভারত শাসন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর কাঠামো ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল।

পিটের ভারত শাসন আইন ত্রুটিমুক্ত ছিল না। বোর্ড অফ কন্ট্রোল ও পরিচালক সভার দ্বৈত শাসনের ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যই ভারত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। পিটের ভারত শাসন আইনে বিলাতে কোম্পানীর পরিচালক সমিতির উপর বোর্ড অফ কন্ট্রোলের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হবার ফলে প্রশাসনগত ত্রুটি লক্ষ্যণীয়। পিটের ভারত শাসন আইনে কোম্পানীকে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে যুদ্ধ না করবার পরামর্শ দেওয়া হলেও তা মান্য করা হয়নি। লর্ড কর্নওয়ালিস পিটের ভারত শাসন আইন ভেঙে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ করেন। বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমতা থাকলে পরিচালকসভা তাকে সন্তুষ্ট করে কাজ করিয়ে নিতেন। ইলবার্টের মতে, পিটের ভারত শাসন আইন ছিল 'জটিল।' পিটের ভারত শাসন আইনে কোম্পানীর উপর সরকারের অবাধ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন ছিল উল্লেখযোগ্য। এডমন্ড বার্ক বলেন, 'সমকালীন পরিস্থিতিতে যা সম্ভব ছিল তা এই আইনে বাস্তবায়িত হয়েছিল।' পিটের ভারত শাসন আইন দ্বারা সরকার ও কোম্পানীর মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল।

প্রঃ (ঙ) তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

উঃ ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সমাপ্তি

Scanned with CamScanner

... এর ৩।(ঘ) প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রঃ (গ) ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

উঃ A. B. Keith তাঁর 'Constitutional History of India' গ্রন্থে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, "মানচিত্র ছাড়া সমুদ্রযাত্রার মতো রেগুলেটিং অ্যাক্ট দ্বারা ব্রিটিশ সরকার সর্বপ্রথম ভারত নামে অজ্ঞাত দেশ সম্পর্কে প্রথম আইন রচনা করেছিলেন।" ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ঠিক করেছিল কোম্পানীর রাজ্য শাসনের অধিকার কেড়ে না নিয়ে কোম্পানীর উপর ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে হবে। যার ফলস্বরূপ ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট দ্বারা ইংল্যান্ডের পরিচালক সভা ও তার অধিকার সংক্রান্ত আইন রচিত হয়। কোম্পানীর সাধারণ সভায় ভোটদানের ক্ষেত্রে বেশী মূল্যের শেয়ার-হোল্ডারদের প্রাধান্য বেড়ে যায়, কারণ ভোটদানের অধিকার তারাই পেয়েছিল। পরিচালক সভার উপর ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ভারতে কোম্পানীর সংগঠন সংক্রান্ত আইনও রচিত হয়েছিল। রেগুলেটিং অ্যাক্টের দ্বারা কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল।

রেগুলেটিং অ্যাক্টের গুরুত্ব ছিল এখানেই যে, কোম্পানীকে সংবিধান অনুযায়ী শাসনে বাধ্য করার চেষ্টা করা হয়। যদিও ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেটিং আক্ট-এ নানা ধরনের ত্রুটি ছিল। কোম্পানীর উপর ব্রিটিশ সরকার কিভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে সে সম্পর্কেও রেগুলেটিং অ্যাক্টে স্পষ্টভাবে কিছু ছিল না। এই অ্যাক্ট-এর ধারাগুলি প্রয়োগ করার সময়ও সমস্যা দেখা দেয়। যার জন্য এই অ্যাক্ট সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা যায়নি। রেগুলেটিং অ্যাক্টের দ্বারা গভর্নর

Scanned with CamScanner

প্রঃ (ঘ) ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে কি তুমি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে মনে কর?

উঃ ব্রিটিশ ঐতিহাসিক যেমন Kaye, Melleson, Trevelyan, Lawrence, Holmes প্রমুখরা মনে করেন এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই বিদ্রোহের জনগণের বড় অংশ সমর্থন জানায়নি। V. D. Savarkar তাঁর 'The Indian war of Independence' গ্রন্থে, যা লন্ডনে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, এই বিদ্রোহকে পরিকল্পিত জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। এই নাটকের পূর্ণ অঙ্ক হিসাবে তিনি ১৮২৬-২৭, ১৮৪৮, ১৮৫৪ এর বিদ্রোহের কথা বলেছেন, যার পরিণতি ছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।

L. E. R. Rees ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ সম্বন্ধে বলেছেন যে, এই ধর্মীয় যুদ্ধ খ্রিস্টান বা জাতিগত সংগ্রাম ছিল শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে। T. R. Holmes বর্ণনা করেছেন যে, এই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সংগ্রাম ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিদ্রোহ। Outram এবং Taylor এই বিদ্রোহকে বলেছেন, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদের ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ ছিল হিন্দু-মুসলিম শ্রেণীর ষড়যন্ত্র স্বরূপ। ইংল্যান্ডের সমসাময়িক নেতা Benjamin Disraeli অবশ্য ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে 'জাতীয় উত্থান' বলে অভিহিত করেছেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857' এবং 'Paramountcy and the Indian Renaissance' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল না। ড. আর. সি. মজুমদার 'History of Freedom Movement' Vol-I গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই বলেছেন, "১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ, না ছিল প্রথম, না ছিল জাতীয়, না ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ।" ভারতবর্ষের বড় অঞ্চল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ থেকে মুক্ত ছিল বলে এই বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদী বলা যায় না। সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে জনসাধারণের ব্রিটিশ বিরোধিতা স্বাধীনতার যুদ্ধ হতে পারে না। উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলী, হরিদ্বার, মোরাদাবাদে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। জাতীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবাদ বিদ্রোহীদের মধ্যে থাকলে এরকম ঘটত না। এমন কোন প্রমাণও নেই যে, জনগণ স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ইংরেজ বিরোধী অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছিল।

Scanned with CamScanner

(৫) বিশেষ অবস্থায় গভঃ জেঃ ও দুই প্রেসিডেন্সীর গভর্নর কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অ
করতে পারেন।

(৬) কর্মক্ষেত্রে পদ খালি হলে তিন বছর চাকুরীরত কর্মচারীকে সেই পদে নিয়োগ ক
পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হয়।

(৭) উচ্চপদে ইউরোপীয়াদেরই নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।

● **প্রশ্ন ঃ পার্লামেন্টের সনদ আইন ১৮১৩ সম্বন্ধে কী জানো?**

○ **উত্তর ঃ** ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন অনুসারে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির বাণিজ্য
অধিকারের মেয়াদ শেষ হবার কথা কিন্তু আগে থেকেই এই অধিকার লোপ করার জ
ইংল্যান্ডে আন্দোলন দেখা দেয়। কারণ নেপোলিয়নের মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা দে
অর্থনীতিতে দারুণভাবে আঘাত করেছিল, তাই অপর বাণিজ্য সংস্থাও ভারতে বাণিজ্
অধিকার দাবি করে। তাছাড়া খ্রিস্টান মিশনারীরা ভারতবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে ভারতে খ্রিস্ট
প্রচারের দাবি জানায়। এই পরিস্থিতিতে পার্লামেন্টে খসড়া পাশ হয়, সনদ আইন—১৮
খ্রিঃ।

এই আইন অনুসারে ঃ

(১) কোম্পানিকে আরও কুড়ি বছরের বাণিজ্য অধিকার দেওয়া হয় ও কোম্পানির একচে
বাণিজ্য অধিকার লোপ করা হয়, কেবল চায়ের উপর ঐ অধিকার বজায় থাকে।

(২) কোম্পানির পরিচালকসভা বা বোর্ড অফ কন্ট্রোল-এর অনুমতি ছাড়া অন্য কে
ইংরেজ কোম্পানি বা বেসরকারি বণিক ভারতে বাণিজ্য করতে পারবে না।

(৩) ভারতে কোম্পানির অধিকারে যেসব অঞ্চল ছিল তার উপর ইংরেজ সরকা
সর্বসময় ক্ষমতার কথা ঘোষণা করা হয়।

(৪) কলিকাতায় মিশনারীরা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অধিকার লাভ করে।

(৫) ভারতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হ

(৬) অসামরিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের হেইলবেরী কলেজের প্রমাণপত্রের প্রয়োজ
হয়।

(৭) এখন থেকে বাণিজ্যিক হিসাব ও রাজস্ব হিসাবে এই দুইভাবে রাখার ব্যবস্থা হ

(৮) চীনের সঙ্গে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার মঞ্জুর করা হয়।

এইভাবে এই আইনে কোম্পানিকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা
ভীত করা হয়।

● **প্রশ্ন ঃ পার্লামেন্টে সনদ আইন—১৮৩৩ সম্বন্ধে কী জানো?**

○ **উত্তর ঃ** ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে কোম্পানিকে ২০ বছরের মেয়াদে যে বাণি
অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণ হবার আগেই পার্লামেন্টে বিতর্ক শুরু
হুইগ বা উদারপন্থী দল ক্ষমতা লাভ করলে ভারতে কোম্পানির কাজ ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ
মতবাদ অনুসারেই চলার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাছাড়া শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে
শিল্পজাত দ্রব্য উদ্বৃত্ত হওয়ায় ভারতের বাজারে ঐ মাল বিক্রির দাবি ওঠে। উদারপন্থী
অনেকেই ভারতের মতো দেশে তাদেরও শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের দাবি ওঠে। এই পরিস্থি
১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টে সনদ আইন বলবৎ হয়। এই আইন অনুসারে ঃ

Scanned with CamScanner

প্রঃ (ঘ) সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কী অবদান ছিল?

উঃ ডা. অমলেশ ত্রিপাঠী বিদ্যাসাগরের সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের যে অবদান ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর ঐতিহ্যবাদী আধুনিকতাবাদের প্রবক্তা।"

বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম চিরস্মরণীয়। সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছিলেন। 'সর্বশুভকরী' পত্রিকাতে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন। হিন্দু বিধবাদের দুর্দশা লক্ষ্য করে তাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলনকেই বোঝায়। 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক' পুস্তিকা রচিত হবার পর হিন্দু সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরকে সমর্থন জানিয়েছিল।

Scanned with CamScanner

শোষণ শুরু হয়। শাসন ব্যাপারে নবাব বা কোম্পানির দায়িত্ব না থাকায় জনসাধারণের দুঃখের সীমা রইল না। দেশে কুশাসন চলতে থাকে। এই অবস্থায় ১৭৭০ খ্রিঃ দুর্ভিক্ষ মহামারী দেখা দেয়। ১৭৭২ খ্রিঃ এই অপশাসনের অবসান ঘটে।

● **প্রশ্ন ঃ ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারে ওয়ারেন হেস্টিংসের অবদান কী?**

○ **উত্তর ঃ** ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকাল (১৭৭২-৮৫ খ্রিঃ) ভারতে ইংরেজ শক্তির বিস্তৃতির কাল। ক্লাইভ নিজ প্রতিভাবলে ভারতে যে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে তা আরও বিস্তার লাভ করে। নবপ্রতিষ্ঠ সাম্রাজ্য যখন ফরাসি আক্রমণের ভয়ে ভীত, মারাঠা, হায়দার আলির আক্রমণ যখন সন্নিকট তখন হেস্টিংসের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা ইংরেজদের আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। উত্তর প্রদেশের রোহিলখণ্ডে আফগানরা একটি রাজ্য স্থাপন করেছিল, অযোধ্যার নবাব ভীত ছিলেন যে সেখানে মারাঠা আধিপত্য স্থাপিত হলে অযোধ্যা বিপন্ন হবে তাই তিনি হেস্টিংসের সাহায্য চান। ৪০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে হেস্টিংস সৈন্য সাহায্য দিয়ে রোহিলখণ্ড অযোধ্যার অধীনে এনেছিলেন। ফলে তাঁর রাজ্যও মারাঠা ভীতি থেকে দূরে ছিল। সময়মতো কতকগুলি সিদ্ধান্ত না নিলে ইংরেজ সাম্রাজ্য যে বিলুপ্ত হতে পারে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। অযোধ্যার নবাবও তাঁর একান্ত অনুগত হয়েছিলেন। রেগুলেটিং অ্যাক্টের বাধা সত্ত্বেও তিনি কোম্পানির পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা তাঁর ছিল সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এ বিচারে বলা যায় ক্লাইভ প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য হেস্টিংসের প্রতিভাতেই প্রসারিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ওয়েলেসলি ও লর্ড হেস্টিংস যে রাজ্যবিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন তার শুরু ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকেই।

● **প্রশ্ন ঃ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কী? কে কী উদ্দেশ্যে এই নীতি প্রবর্তন করেন?**

○ **উত্তর ঃ** অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি হল বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে দেশীয় রাজন্যবর্গদের নিরাপত্তা রক্ষার নামে ঐ সব রাজ্যে তাদের ব্যয়ে একদল ইংরেজ সৈন্য পোষণ করতে বলা ও তাদের উপর ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপনে অগ্রসর হওয়া।

লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রিঃ) ছিলেন এক সাম্রাজ্যবাদী শাসক। ভারতের রাজনৈতিক এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে তিনি শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। ভারতে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপন করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি তাঁর পূর্ববর্তী শাসক স্যার জন শোরের সময়কার "ঔদাসীন্য" নীতি পরিত্যাগ করে এক নতুন পদ্ধতির প্রয়োগে ইংরেজ প্রধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে "অধীনতামূলক" মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন।

এই নীতি অনুসারে—দেশীয় রাজাদের এই নীতি গ্রহণ করে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করতে হত, ও অপর কোনো রাজ্যের সঙ্গে সন্ধি করার অধিকার ত্যাগ করতে হত অর্থাৎ ইচ্ছামতো অন্য কোনো রাজ্যের সঙ্গে কোনো সন্ধি ইংরেজদের মত না নিয়ে করতে পারত না। ঐ রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য নিজ ব্যয়ে পোষণ করতে হত, এসবের বিনিময়ে অবশ্য ইংরেজদের কাছ থেকে মিত্রতাসুলভ ব্যবহারই পাওয়া যেত তা হল ঐ রাজ্যকে ইংরেজরা বহিঃশত্রুর ও গৃহশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করত। এই নীতি গ্রহণ করলে দেশীয় রাজাদের যেমন স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হত তেমনি তাদের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। এইভাবে ওয়েলেসলি নতুনভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

কোম্পানি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। কোম্পানির আর্থিক স্বচ্ছলতা দারুণ বেড়ে গেল, ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত হল, বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হিসাবে পরিচিতের পথ পেল।

● **প্রশ্ন : পলাশি যুদ্ধের গুরুত্ব বিচার করো।**

○ **উত্তর : রাজনৈতিক গুরুত্ব :** সামরিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে গেলে পলাশি যুদ্ধকে বলা যায় না ওটাকে খণ্ড যুদ্ধই বলা উচিত। কিন্তু যেকোনো বিরাট যুদ্ধের তুলনায় এর গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। এই যুদ্ধে নবাবের জয় হলে ভারতের ইতিহাস অন্যপথে চালিত হত। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করতে হলে বলা উচিত "Plassey is the gateway of British supremacy in India." বাস্তবিকই এখানে জয়লাভকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ শক্তির আধিপত্য বিস্তারের সূচনা। এখানের জয় ও সংগৃহীত অর্থ দাক্ষিণাত্যের জয়কে সম্ভব করেছিল, তাই পলাশির রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : বরাবর ইংরেজ কোম্পানি বাংলার বাণিজ্যের দিকে নজর রেখে পরিমাণ বৃদ্ধিতে উৎসাহী ছিল। এখন থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হল ও একচেটিয়া বাণিজ্যের সুযোগ পেল। ঐতিহাসিকরা এই অধিকারকেই 'লুণ্ঠন' আখ্যা দিয়েছেন। বাংলার অফুরন্ত সম্পদ ইংল্যান্ডে চালান হতে লাগল, কোম্পানির অর্থভাণ্ডার স্ফীত হতে লাগল। বাণিজ্যিক এক প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পথে পা বাড়াল।

সাংস্কৃতিক গুরুত্ব : পলাশি যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের আর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ভারতে নবযুগের সূত্রপাত। শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসায় ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হল।

● **প্রশ্ন : দ্বৈত শাসন কী? কে কী উদ্দেশ্যে এই শাসন প্রবর্তন করেন? ইহার গুণ ও দোষ বিচার করো।**

○ **উত্তর :** ১৭৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানি লাভ করে ক্লাইভ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মন দিলেন। বাংলার সুবাদার দুই ধরনের কাজ করতেন—দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি বিচার এবং নিজামত বা সামরিক ও ফৌজদারি বিচার নিয়ন্ত্রণ। বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে নবাব রাজস্বের সব দাবি ত্যাগ করলেন। বেসামরিক শাসন দায়িত্বে রইলেন নবাব, আর সামরিক শাসন রইল কোম্পানির হাতে, এই ব্যবস্থাই দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত।

উদ্দেশ্য : ক্লাইভ প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণে রাজী ছিলেন না প্রত্যক্ষভাবে ওই দায়িত্ব নিলে অন্য ইউরোপীয় বণিকরা খারাপ মনোভাব পোষণ করতে পারত তাছাড়া রাজস্ব ব্যাপারে তার কর্মচারীরা অনভিজ্ঞ ছিল। তাদের রাজস্ব ও দেওয়ানি কাজ চালাবার প্রয়োজনমতো কর্মচারীও ছিল না তাই ক্লাইভ এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন।

গুণ : দ্বৈত শাসনব্যবস্থার গুণ ও দোষ উভয়ই ছিল : নিজেদের কর্মচারী না থাকায় দেশীয় ব্যক্তিদের দিয়ে কাজ পরিচালনায় সুবিধা হয়েছিল। প্রত্যক্ষভাবে শাসনকাজ গ্রহণে অসুবিধাও ছিল; ফলে অন্য ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল।

দোষ : এই ব্যবস্থার দোষের মধ্যে প্রধান ছিল এই যে নবাবের নায়েব সুবাদের উপর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। কোম্পানিও এদের কাজে হস্তক্ষেপ করত না, ফলে কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ ব্যবসা বৃদ্ধি পায়। তারা ব্যক্তিগত ব্যবসায়

Scanned with CamScanner

দেওয়া হয়।

● প্রশ্ন ঃ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব আইন পাশ করা হয় সেগুলি উল্লেখ করো।

○ উত্তর ঃ (1) ১৭৭৩ খ্রিঃ রেগুলিটিং আইন—ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ১৭৭৩ খ্রিঃ এই আইনটি পাশ হয়।

Scanned with CamScanner

ভাইসরয়।

● **প্রশ্ন ঃ ভারতের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।**

○ **উত্তর ঃ** উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ভারতে শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের কোনো আগ্রহ ছিল না, তাই শিক্ষাও অবহেলিত ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে শিক্ষিতা স্ত্রীলোক প্রায় দেখা যেত না সম্ভ্রান্ত পরিবার ছাড়া, যেখানে নিজ চেষ্টাতেই তারা বিদ্যালাভ করত। ক্রমশঃ পণ্ডিত ব্যক্তিদের উদ্যোগে ও বেসরকারি চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হয়।

ভারতের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে ব্রাহ্মসমাজের অবদান সর্বাধিক, পাঞ্জাবের মহাকন্যা বিদ্যালয় স্থাপন আর্যসমাজের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, মহারাষ্ট্রের প্রার্থনাসমাজের অবদানও কম নয়। খ্রিস্টান মিশনারীরাও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে কম আগ্রহী ছিল না। তাদের চেষ্টায় ১৮১৮ খ্রিঃ হুগলীতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঐ সময়েই কলিকাতায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। মিশনারীদের চেষ্টায় ১৮২১-২৪ খ্রিঃ মধ্যে উঃ প্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৮৪৯ খ্রিঃ স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সময়ও বেথুন ও বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় কিছু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এখন থেকে স্ত্রীশিক্ষা সরকারি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উডের সুপারিশ অনুসারে বেথুন সরকারি সহযোগিতায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়। ১৮৭৭ খ্রিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের প্রবেশের অনুমতি দান এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তারাও ডিগ্রী লাভের গৌরব অর্জন করে ও মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ পায়। হান্টার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (১৮৮২ খ্রিঃ)। এই দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার শুরু হলে দেশে সর্বত্র স্কুল ও কলেজের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে ও প্রাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯০২ সালের মধ্যে প্রায় ৫,৭০০ হয়। অধ্যাপক কার্ভের চেষ্টায় পুনাতে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় (১৯১৬ খ্রিঃ)। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হয়।

● **প্রশ্ন ঃ ভারতে সংবাদপত্রের বিকাশ ও তার অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।**

○ **উত্তর ঃ পটভূমিকা ঃ** পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের সুযোগ ঘটে, কিন্তু এই কাজের প্রধান মাধ্যমই হল সংবাদপত্র যার সাহায্যে দেশ-বিদেশের সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না, ১৮৫৭ সালের পর কয়েক ইংরাজি ও ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের ব্যাপারে ইংরেজদের কোনো আগ্রহও ছিল না তাদের চেষ্টায় ইংরাজিতে যে কয়খানি সংবাদপত্র ছিল তা তাদের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করত।

Scanned with CamScanner

না।

তবে প্রথম প্রজন্মের সকল প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌রা ভারতবর্ষের আমলতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত
মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। হেস্টিংস যে 'ভারতদরদী' প্রশাসকবর্গ নির্মাণ করতে চেয়েছিলে
তা সত্য। তবে এদেশের বৌদ্ধিক জীবন সম্পর্কে তাদের যতটা আগ্রহ ছিল প্রবহমান জীবনে
তারা ততটা গুরুত্ব দেননি। প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার তাদের হাতেই ঘটেছিল। কি
এদেশের ইসলামিক সভ্যতার উজ্জ্বল দিকগুলিকে তাঁরা এড়িয়ে যান, যা ভবিষ্যতের শা
শাসনে ভেদনীতির কায়েমে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, ভারতবর্ষের এক
ধারাবাহিক এবং বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাস রচনায় প্রাচ্যবাদীরা (ওরিয়েন্টালিসরা) তাঁদের গবেষ
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

● **প্রশ্ন ঃ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।**

○ **উত্তর ঃ** ব্রায়ান হ্যাচার প্রাচ্যবিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিদ্যাকে 'Umbrella Categories' বলে
বর্ণনা করতে চান। কেননা এই ছত্রছায়ায় বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার বহু ব্যক্তিত্বের সম্মিলন ঘটেছিল
যেমন প্রতীচ্যবাদীদের মধ্যে আলেকজান্ডার ডাফ-এর মতো মিশনারী এবং রামমোহন রায়ের
অবস্থান ছিল, তেমনি শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রাচ্যতত্ত্ববিদরাও একমত ছিলেন না। এডোয়ার্ড
সেইড (Said) -এর বিশ্বাস শেষোক্তরা ক্ষমতার জন্য জ্ঞানান্বেষণে আগ্রহী হয়েছিলেন। হ্যাচার

Scanned with CamScanner

বক্সারের যুদ্ধের পর দ্বিতীয়বার নবাব হয়ে মীরজাফর ... অধিকারের সঙ্গে বাণিজ্যে বাধাদানকারী সরকারি কর্মচারীদের শাস্তিদানের অধিকার কোম্পানিকে দিয়েছিলেন। (vi) এই যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজদের তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য আর যুদ্ধ করতে হয়নি। এরপর তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করেছিল। বক্সারের যুদ্ধের পর পূর্ব ভারতে ইংরেজগণ অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত হল এবং স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজগণ বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করলেন।

● **প্রশ্ন ঃ মীরকাশিম নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেন? বাণিজ্যিক শুল্ক নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশিমের বিরোধ কী ছিল?**

○ **উত্তর ঃ প্রথমত,** ইংরেজ কোম্পানির প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাসের জন্য মীরকাশিম ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ভূস্বামী ও কর্মচারীদের দমন করেন। **দ্বিতীয়ত,** নবাবের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে পাশ্চাত্য সামরিক শিক্ষাদানের জন্য তিনি সমরু, মার্কার প্রভৃতি ইউরোপীয় সেনানায়ককে নিয়োগ করেন। **তৃতীয়ত,** নবাবের আর্থিক অসুবিধা দূর করার জন্য বৈধ-অবৈধ সকল উপায়ে মীরকাশিম অর্থসংগ্রহে তৎপর হয়েছিলেন। **চতুর্থত,** নবাবের এইসব প্রস্তুতি ইংরেজদের দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্য বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে সরিয়ে নিয়ে যান।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্কের প্রশ্নে নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে কোম্পানির সংঘর্ষ দেখা দেয়। (i) কোম্পানিকে যে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তার অপব্যবহার করে কোম্পানির কর্মচারীরাও বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্য করত। (ii) অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে দেশীয় বণিকরা কোম্পানির 'দস্তক' বা ছাড়পত্র ব্যবহার করে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করত। এর ফলে প্রত্যক্ষভাবে নবাবের রাজস্বের ক্ষতি হত। দেশীয় বণিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হত। কারণ শুল্ক দিয়ে তারা প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করত না। মীরকাশিম

940
AZ-ITI
5269

কথা প্রচারের সঙ্গে ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পর্যায়ে জঙ্গল মহলে বিদ্রোহ শুরু হয়। জমিদারদের সঙ্গে চুয়াড় পাইকরা এ বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল।

মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট গ্রাহাম-এর আদেশে লেফটেন্যান্ট ফার্গুসন সেনাবাহিনী নিয়ে জঙ্গলমহল অধিকার করতে আসেন। তীব্র সংগ্রামের পর রামগড়, জামবনী, লালগড়, শালদা প্রভৃতি জঙ্গলমহলের জমিদারগণ কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করেন। সিংভূম, মানভূম ও বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জমিদারদেরও ইংরেজরা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। জমিদারদের সঙ্গে কোম্পানীর এই সংগ্রামে পাইক চুয়াড়রা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। জমিদার ও চুয়াড়গণ ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল।

চুয়াড় বিদ্রোহ ছিল ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কৃষক ও জমিদারদের সংগ্রাম এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। চুয়াড় বিদ্রোহ পরবর্তীকালের কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। চুয়াড় বিদ্রোহ কৃষক ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চুয়াড় বিদ্রোহ দলবদ্ধভাবে এক হয়ে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের শিক্ষা দিয়েছিল। চুয়াড় বিদ্রোহ পরবর্তীকালের সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল।

১৭৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় পর্যায়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁকুড়া ও উত্তর-পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল ব্যাপকভাবে। ইংরেজ শক্তির শোষণ ও অত্যাচার চুয়াড় বিদ্রোহকে ব্যাপক ও সর্বাত্মকভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। জমি থেকে উচ্ছেদ করায় তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। চুয়াড় বিদ্রোহ বাংলা বিশেষ করে মেদিনীপুর ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। চুয়াড় বিদ্রোহ এই সময়ে এই অঞ্চলের কৃষকদের ইংরেজ ও জমিদার বিরোধী সংগ্রামকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ হিসাবে চুয়াড় বিদ্রোহের (পশ্চিম বাংলা) গুরুত্ব রয়েছে।

Scanned with CamScanner

ক্ষমতা খর্ব করতে সচেষ্ট ছিল। টিপু সুলতান পলিগারদের মূল ভূখণ্ডের দখল নিয়েছিলেন। উইলকর্মের মতে, 'টিপু সুলতানকে জানানো হত পলিগাররা বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু পলিগাররা প্রকৃতপক্ষে বিলুপ্ত হয়নি।" পলিগারদের স্বার্থে আঘাত লাগায় পলিগাররা বিদ্রোহ করত। যদিও 'পলিগার বিদ্রোহ' বৃহৎ আকার ধারণ করেনি। তা সত্ত্বেও পলিগারদের বিদ্রোহীপ্রবণ মনোভাব টিপু সুলতানের সময়কালে বারে বারেই প্রকাশ পেয়েছে। হায়দ্রাবাদের বিদনুর ও মালাবার প্রদেশে পলিগারদের অধিকাংশ বিদ্রোহ হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'পলিগার বিদ্রোহ' স্তিমিত হয়ে আসে।

Scanned with CamScanner

ইতিহাসগত বিচারে প্রাচ্যতত্ত্বকে সাম্রাজ্যবাদের 'handmaiden' হিসেবে মানতে রাজী হলেও, তার অপরাপর বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। ডেভিড কফ সেইদ-এর মতো 'a set of proposition' না বলে তাকে 'a historically changing and internally diverse set of phenomena' রূপে উপস্থিত করেছেন। তিনি স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর মতো প্রথম যুগের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্যার 'classiest world view'-এর সঙ্গে পরবর্তী প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের রোমান্টিসিজমের পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রথমদিকের প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা যে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে ধ্রুপদী শাস্ত্রচর্চার সঙ্গে প্রশাসনিক প্রয়োজনের কথাও ভাবতেন তা হেস্টিংস-এর আইনসংস্কার প্রচেষ্টার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। বেনারসের সংস্কৃত কলেজ যে নিকট ভবিষ্যতে ডাক্তার এবং আইনজ্ঞদের লালনক্ষেত্র হয়ে উঠবে, এ বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন জোনাথন ডানকান। ১৮০০ খ্রিঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা ছিল এমনই এক বৈষয়িক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদের ফল। বলা বাহুল্য যে উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে ভারতীয় জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার কোনো বাসনা ইংরেজদের ছিল না। প্রাচীনকে জানার যে আগ্রহ প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের ছিল তা মেটাতে সহায়তা করা ছাড়া সরকারের শিক্ষানীতি, দোভাষী সৃষ্টি ও অধঃস্তন কর্মচারী সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। জনগণের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ ছিল ইভান জেলিক্যালদের এবং ১৮১৩-র চার্টার অ্যাক্ট তাদের ভারতে কাজ করার অনুমতি দিলে তারাই হয়ে ওঠেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রাচ্যবিদ্‌দের প্রধান সহায়। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সহযোগিতা প্রসঙ্গে ডেভিড কফ তাই 'mutual institutional usefulness'-এর কথা বলেছেন।

ব্রায়ান হ্যাচার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাদীদের ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। Cosmopolitan Orientalist, The Evangelical Vernacularist এবং The Improving Vernacularist. (এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বিদ্যাসাগর)। অনুরূপভাবে প্রতীচ্যবাদীদের তিনি the Imperialist Anglicist, the Evangelical Anglicist এবং Improving Anglicist শ্রেণীতে বিভক্ত করে দুই গোষ্ঠীভুক্তদের শিক্ষাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিচার-বিশ্লেষণের পক্ষপাতী।

ওয়ারেন হেস্টিংস এবং উইলিয়াম জোন্স-এর মতো Cosmopollitan Orientalist ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃত বিষয়ে অনুরাগী হয়েছিলেন। শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নয়, মানবসভ্যতার প্রকৃতি অনুধাবনেও তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে শুভেচ্ছার সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তারের মতো রাজনৈতিক তাগিদ হেস্টিংস-এর মধ্যে যে মানসিক সংঘাত সৃষ্টি করেছিল, তার প্রমাণ উইলকিন্সের ভাগবত গীতার অনুবাদ গ্রন্থে তাঁর লেখা ভূমিকার মধ্যে আছে। জোন্স-এর মহৎ দুর্বলতা ছিল পেছনে ফেলে আসা স্বর্ণযুগের প্রতি। জোন্স বিশ্বাস করতেন যে বর্তমান হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি যতই নিম্নমানের হোক না কেন "In some early age they were splendid in arts and arms, happy in government, wise in legislation and eminent in various knowledge". হ্যাচারের মতে, 'Cosmopolitan' প্রাচ্যবিদদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল ধ্রুপদী চর্চার সঙ্গে প্রশাসনিক pramatism যুক্ত করা। আর Evangelical Orientalist-দের কাছে শুধু খ্রিস্টীয় সমাচার প্রচার নয়, তা ভারতীয়দের নিজের ভাষায় তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উইলিয়াম কেরীর ভূমিকা একারণেই প্রাচ্যপ্রেমী হয়ে ওঠে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ধাত্রীর ভূমিকা নিয়ে

প্রঃ (৬) বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৭৭০-এর মন্বন্তরের প্রভাব কি হয়েছিল?

উঃ গভর্নর কার্টিয়ারের সময়কালে বাংলায় ১১৭৬ বঙ্গাব্দে এবং ইংরেজী ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত ছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে প্রভাব ফেলেছিল।

১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে মন্বন্তরের প্রভাবে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বাংলায় জনসংখ্যার ১/৩ অংশ ধ্বংস হয়েছিল এবং ১/৩ অংশ কৃষি জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়েছিল। জেমস মিল ও ওয়ারেন হেস্টিংস বলেন বাংলা ও বিহারে মোট ১ কোটি ব্যক্তির মৃত্যু হয়। নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, যশোহর, মালদহ, ২৪ পরগনা, রাজশাহী ও বিহারের পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলাগুলিতে অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। সরকারী ত্রাণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মাত্র ৯০ হাজার টাকা খরচ করা হয় বলে হান্টার জানিয়েছেন। এর দ্বারা অর্থনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলায় কৃষক শ্রেণী ছাড়াও সামন্তশ্রেণী ও কারিগরশ্রেণীও ধ্বংস হয়। হান্টার বলেন, জমিদারদের বেশীর ভাগই এই মন্বন্তরে ধ্বংস হয়েছিল। বাংলার অর্থনৈতিক দুরবস্থা লক্ষ্য করা যায়। কোম্পানীর বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ক্ষতি হয়েছিল। মন্বন্তরের ফলে পণ্যের উৎপাদন কমে যাওয়ায় কোম্পানীর রপ্তানীও হ্রাস পেয়েছিল। লবণ ও সোরা শিল্প উৎপাদনকারীদের ব্যাপক সংখ্যক মৃত্যু হওয়ায় এই শিল্পগুলি ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কৃষি, শিল্প সব দিক থেকেই অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাবে বহু জমি অনাবাদী থাকে। ফলে সেগুলি বনজঙ্গলে পরিণত হয়। চাষের কাজের জন্য কৃষক না থাকায় কৃষক ও জমিদারের সম্পর্কের পরিবর্তন হয়। জমিদাররা উদার নীতির দ্বারা কৃষকদের দিয়ে জমি চাষ করিয়ে নেয়। কোম্পানী ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজস্বের আয় কমে গিয়ে বাণিজ্য ক্ষেত্রে মন্দা দেখা যায়। পার্সিভ্যাল স্পিয়ার বলেন কোম্পানীর স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্য ও বাংলার কৃষি শিল্পকে রক্ষা করার জন্য দ্বৈত শাসন লোপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসকে এইভাবে প্রভাবিত করেছিল।

Scanned with CamScanner

উচ্চপদে ভারতের কারও নিয়োগ ...
ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কারণ ইতিমধ্যেই রাজা রামমোহন রায় পার্লামেন্টে ...
কাছে ভারতবাসীর পক্ষে বক্তব্য রাখার যে সুযোগ পেয়েছিলেন তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

● **প্রশ্ন : পার্লামেন্টের সনদ আইন ১৮৫৩ সম্বন্ধে কী জানো?**

○ **উত্তর :** ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববর্তী সনদ আইনের মেয়াদ শেষ হলে পার্লামেন্ট ঐ আইন পুনরায় মঞ্জুর করে কিন্তু এইবার এই আইন বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। কারণ পূর্ববর্তী আইনগুলো যেমন ২০ বছরের মেয়াদে ছিল এটি সেরূপ ছিল না বা এতে মেয়াদকাল উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ভারতে কোম্পানির শাসনকাল শেষ হয়ে এসেছিল, পার্লামেন্ট যেকোনো সময় শাসনের সব দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য ইতিমধ্যে ভারত সাম্রাজ্যে আরও বিস্তার ঘটে। কারণ সিন্ধু ও পাঞ্জাব ছাড়াও কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের ভার কোম্পানির হাতে আসে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন অনুসারে :

(১) বাংলার জন্যে একজন লেঃ গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

(২) বারোজন প্রতিনিধি নিয়ে গভঃ জেঃ পরিষদ গঠিত হয়।

(৩) পাঞ্জাব পৃথক প্রদেশ হয় ও সেখানকার জন্যে একজন গভর্নর নিযুক্ত হন।

(৪) পরিচালকসভার সদস্য সংখ্যা ২৪-এর স্থলে ১৮ করা হয়।

(৫) এখন থেকে বিলাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।

(৬) এই আইনে "ইংল্যান্ডের রানী ও তাঁর উত্তরাধিকারদের অনুকূলে" ভারত শাসনের অধিকার মঞ্জুর করা হয়।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতার পৃথকীকরণ ভারতের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য দিক। গভঃ জেঃ পরিষদে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি না রাখার কুফল কোম্পানি তথা ইংরেজ সরকার মহাবিদ্রোহের পর উপলব্ধি করেছিল। এই আইন ভারতে ইংরেজ শাসনের পথ প্রস্তুত করে রেখেছিল।

Scanned with CamScanner

উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় শিল্প বিশেষ করে কুটির শিল্প ও বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসসাধনকেই অবশিল্পায়ন বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

বাংলাতে মারাঠা বর্গীর হামলার ফলে কারিগর শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে তাঁতি ও কারিগরদের ক্রমাগত শোষণ করার ফলে বস্ত্রশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আসলে এ সমস্ত কারণে অবশিল্পায়ন হয়নি। মূলতঃ ইংল্যান্ডের যন্ত্রচালিত সস্তার মালের তুলনায় ভারতীয় তাঁত বস্ত্রশিল্প প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছিল। তার সঙ্গে চড়া হারে শুল্ক স্থাপন ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করে দেয়। Wilson 'History of India' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "ভারতীয় বস্ত্রের উপর চড়া হারে শুল্ক ও আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করলে ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রশিল্প কলগুলি চালু থাকত না। ভারতের শিল্পকে ধ্বংস করেই ব্রিটেনের যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল।" Wilson বলেন হ্যামিলটন যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প ধ্বংসের যে অনিবার্যতার কথা বলেছেন তা সঠিক নয়। অবশিল্পায়ন নিয়ে মরিস. ডি. মরিস, তরু মাৎসুই, অমিয় বাগচী প্রমুখগণ তাঁদের মতামত দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও 'অবশিল্পায়ন' বলতে বোঝায় ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন-এর বিষয়টি। সত্যিকারের ভারতে 'অবশিল্পায়ন' হয়েছিল কি না তা নিয়ে আজও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক বিদ্যমান।

প্রঃ (ছ) পলিগার বিদ্রোহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

উঃ 'পলিগার'রা ছিল এক ধরনের সামরিক সামন্ত সর্দার যারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সামরিক সাহায্য দানের বিনিময়ে জমি ও জায়গীর ভোগ করত। হায়দ্রাবাদের বিদনুর ও মালাবার প্রদেশে পলিগারদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। পলিগারদের জায়গীরের নাম ছিল 'পালাইয়াম'। পলিগারদের প্রদেয় রাজস্ব ও পেষকাশের হার বৃদ্ধি করার ফলে পলিগারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা খর্ব হয়েছিল। পলিসাররা হায়দার আলির সময়কালে মাঝে মধ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।

টিপু সুলতান পলিগারদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু উইলকস্ বলেন যে, "পলিগার সম্প্রদায় বেনামীতে তাদের অধিকার অনেক ক্ষেত্রে কায়েম রাখতে সক্ষম হয়েছিল।"

টিপু সুলতানের রাজত্বে পলিগাররা বিদ্রোহপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। পলিগাররা টিপুকে পছন্দ করতো না কারণ টিপু পলিগারদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে হায়দার আলী মালাবার আক্রমণের সময় টিপুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। হায়দার আলী বেদনুর প্রদেশে দক্ষিণে পার্বত্য অঞ্চল বালাস আক্রমণ করেন। এই অঞ্চলের পলিগাররা

Scanned with CamScanner

মাধ্যমেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হলে একাজ দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

১৭৮০ খ্রিঃ জেমস অগাস্টাস হিকি সাপ্তাহিক বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করেন, সরকারি কাজে দুর্নীতি প্রকাশে এই ইংরাজি সাপ্তাহিকটি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। কয়েক বছরের মধ্যে আরও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়—ইন্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, হরকরা। মাদ্রাজেও ইন্ডিয়া হেরাল্ড, মাদ্রাজ কেরিয়ার প্রকাশিত হয় (১৮১৯ খ্রিঃ)। বোম্বাই থেকেও বোম্বে হেরাল্ড, বোম্বে গেজেট প্রকাশিত হয়। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক দোষ তুলে ধরাই ছিল হিন্দু কলেজের ছাত্রদের 'পার্থেনান'-এর উদ্দেশ্য।

বাংলাভাষাতেও বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনারীদের দিগ্‌দর্শন এই সময় প্রকাশিত হয় (১৮১৮ খ্রিঃ), বাংলাতে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের বাংলা গেজেট ঐ সময়কার পত্রিকা, সমাচার দর্পণ, সংবাদ কৌমুদি (১৮২১ খ্রিঃ), সমাচার চন্দ্রিকা একই সময় প্রকাশিত হয়। এইসব পত্রিকা মারফৎ তদকালীন সমাজের চিত্র জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ খ্রিঃ ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ইয়ং বেঙ্গলের জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞান সেবধি ও অক্ষয় দত্তের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করা হয় (১৮৪৩ খ্রিঃ)। এইসব পত্রিকা বন্ধের জন্য যে আইন জারি হয় তা ১৮৩৫ খ্রিঃ প্রত্যাহৃত হয়। মহাবিদ্রোহের পূর্বে এইসব পত্রিকা স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের জাতীয় চেতনার উন্মেষে এদের দান অসীম।

● **প্রশ্ন ঃ লর্ড ওয়েলেসলির সংস্কারসমূহ আলোচনা করো।**

○ **উত্তর ঃ** লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকাল (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রিঃ) ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কাল। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক, কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। একাজে তিনি পূর্ববর্তী শাসকদের নিরপেক্ষতা নীতি গ্রাহ্য করেন নি। এদিক থেকে শাসক হিসাবে ছিলেন কর্মকুশলী ও প্রখর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি অসাধারণ প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে তাঁর রাজত্বকাল গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়। আরও এক কারণে তাঁর শাসনকাল ভারত ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ যদিও ডঃ স্মিথের মত—"লর্ড ওয়েলেসলি ছিলেন সর্বতোভাবে কূটনীতিক এবং অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন"। তবু একথা বলতেই হবে যে সারা রাজত্বকাল যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকলেও অভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়েও তিনি শৃঙ্খলারক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। শাসন কাজের সুবিধার জন্যেই তিনি এদেশে নিয়োগের পূর্বে বা কর্মচারীদের এদেশের নানা তথ্য জ্ঞাত করানোর উদ্দেশ্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন তা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কাজ থেকেই বোঝা যায়। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় এই কলেজ স্থাপিত হয়। "এই কলেজ ভবিষ্যতে প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে পরিণত হবে" এই ছিল তাঁর আশা। এখানে ইংরাজি সাহিত্য, ইউরোপের ইতিহাস, ভূগোল, ভারতীয় ভাষা, বিজ্ঞান ও আইন পড়ানো হত। এই কলেজের পণ্ডিতদের চেষ্টায় বাংলাভাষা ও সাহিত্য উন্নত হয়। বাংলা বিভাগের প্রধান উইলিয়াম কেরীর বাংলা ব্যাকরণ ... প্রসার তখন থেকেই।

Scanned with CamScanner

প্রণীত 'Elements of International Low' গ্রন্থটি চীনা ভাষায় অনু

এই দেওয়ানি লাভের গুরুত্ব ছিল যে, এতদিন পর্যন্ত বাংলার নবাবের উপর ই
কর্তৃত্বের আইনগত কোনো স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু মুঘল বাদশা কোম্পানিকে 'দেওয়া
করার ওই অধিকার আইনসম্মত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, বাংলা, বিহার,
রাজস্ব কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীনে আসবার ফলে কোম্পানিকে ইংল্যান্ডের উপর
সরবরাহের জন্য আগের মতো এতটা নির্ভর করতে হত না। তৃতীয়ত, দেওয়ানি
কর্তৃত্ব কোম্পানি গ্রহণ করবার ফলে এদেশে যে দ্বৈত-শাসনের সূচনা হয় তাতে বা
দেখা দিয়েছিল। চতুর্থত, কোম্পানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা
হয়।

Scanned with CamScanner

জেনারেল কর্তৃক ১৮২৩ সালে 'জেনারেল কমিটি অফ পাব্লিক ইনস্ট্রাকশন' গঠন করা এই কমিটির উপরে ১৮১৩-তে অনুমোদিত শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দের দায়িত্ব অর্পণ। হোরেস হেমেন উইলসনের মতো প্রাচ্যপ্রেমী-এর সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায় মনে হয়েছিল যে প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ সুনিশ্চিত। উইলসনের আমলেই, ১৮২৪ সালে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উইলসনের মধ্যে আর এক ধরনের প্রাচ্যপ্রেমীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছিল। এ দেশে পশ্চিমের শিক্ষাদীক্ষা প্রসারে তিনি আন্তরিকভাবেই আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্যপন্থীদের মতো তিনি এটা মানতে রাজী ছিলেন না যে, এই জ্ঞানবিজ্ঞান ইংরেজির মাধ্যমেই বিতরণ করা আবশ্যক। তাঁর বক্তব্য ছিল "Indians must be taught knowledge, not speech", তাঁর প্রকাশের মাধ্যম ভারতীয়দের আয়ত্তেই ছিল, প্রয়োজন কেবল "a better stock of ideas." উইলসন এজন্য দেশীয় ভাষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর প্রাচ্যবিদ্যা নিঃসন্দেহে জোন্স বা কোলব্রুকের প্রাচ্য বিদ্যানুরাগের থেকে আলাদা ছিল, 'Cosmopolitan curiosity' বা ইভানজেলিক্যাল উদ্যমের বদলে 'improvement'ই তাঁর বিচারে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাচার লিখেছেন, 'Suice in Wilson's case, this improving drive was coupled with a reverence for the best of India's ancient heritage, it makes sense to speak of him as an 'Improving Orientalist'.

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য আরো দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি নবদ্বীপ অপরটি মিথিলাতে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন লর্ড মিন্টো। কিন্তু লর্ড হেস্টিংস-এর আমলে তা পরিত্যক্ত হয়। উইলসনই তাঁকে বোঝান যে জেলায় এ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠার চেয়ে প্রশাসনিক কেন্দ্র কলকাতাতেই একটা শিক্ষা নিকেতনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। সেকারণে ১৮২১-এর আগস্টে কলকাতায় এক সরকারি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং ১৮২৬ সালে এর ভবন নির্মিত হলে একদিকে সংস্কৃত কলেজ, অপরদিকে হিন্দু কলেজ বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হ্যাচার লিখেছেন "In this way the building itself gave physical expression to the tension between Auglicist and Orientalist ideals." সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন রামমোহন রায়। স্বয়ং বাংলায় বেদ অনুবাদে প্রয়াসী অনুরাগী রামমোহনের পক্ষে এ ধরনের আচরণ বিস্ময়কর বলে মনে হলেও এ সময়ে শিক্ষা সংস্কৃতির পরিবেশের জটিলতা ও প্রসার বিরোধিতায় তা স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

রামমোহনের এই ভূমিকার জন্য তাঁকে প্রতীচ্যবাদী বলে চিহ্নিত করতে হয়, যদিও এই গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্যদের থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আলাদা। তাঁর লেখার কোথাও কেবল ইংরেজির পক্ষে কোনও সুপারিশ পাওয়া যায় না। উইলসনের মতো তিনিও দেশীয় জ্ঞানচর্চার সঙ্গে প্রতীচ্যের শিক্ষাদীক্ষার সমর্থক ছিলেন, যদিও English modernism-এর প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল প্রকট। ডেভিড কফ তাই তাঁকে 'Orientalist modernizer' বলেছেন। তবে হ্যাচারের মতে, রামমোহনকে প্রাচ্যতত্ত্বপ্রেমী বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। উইলসনের সঙ্গে 'Orientalism' নয়, 'Virtues of improvement'-এর বিষয়ে তিনি ছিলেন একমত। Anglicism-এর 'improving' দিকটাই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বেশি এবং এর সাহায্যেই তিনি এদেশের

ড. এস. এন. সেন কিন্তু মনে করেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল। কিন্তু বেশীরভাগ জনগণের বিদ্রোহে অংশগ্রহণ না করার প্রবণতা ছিল। তাদের মধ্যে অংশগ্রহণ করার উৎসাহও ছিল না। সেইজন্য জাতীয় চরিত্র আরোপ করা হয়নি। এই বিদ্রোহ পূর্বপরিকল্পিত না হলেও এই বিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা যাবে না একথা ড. এস. এন. সেন স্বীকার করেননি। ড. এস. বি. চৌধুরী তাঁর 'Civil Rebellions in the Indian Mutinies : 1857-59" গ্রন্থে বলেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ দুটি ধারায় বিভক্ত—বিদ্রোহ এবং অভ্যুত্থান।

মার্কসবাদী বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যায়, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ ছিল, সিপাহী ও কৃষকদের মিলিত গণতান্ত্রিক জোটের বিদেশী তথা সামন্ততান্ত্রিক ধারার বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও বাহাদুর শাহকে স্বাধীন সম্রাটরূপে ঘোষণা এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্যাদায় ভূষিত করেছিল। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আদর্শও এই বিদ্রোহকে জাতীয় সংগ্রামের মর্যাদা দিয়েছিল। বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা এই বিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধের মর্যাদা দিয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ ছিল মূলত উপনিবেশবিরোধী এবং সিপাহীরা এবং জনগণ উভয়েই সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের উচ্ছেদ করার জন্যই এই বিদ্রোহ গড়ে তুলেছিল।

Scanned with CamScanner

আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে সংস্কারের আশা পোষণ করতেন। তবে এ দেশের স্বতন্ত্র সত্তা প্রতীচ্যের প্রবল প্রভাবে বিলীন হয়ে যাক, তা তিনি চান নি।

প্রতীচ্যের শিক্ষাদীক্ষাকে প্রাচ্যবিদ্যার স্থলাভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন স্কটিশ মিশনারী আলেকজান্ডার ডাফ, সরকারি মহলে যিনি ছিলেন প্রবল প্রতাপী। হিন্দুধর্মকে বিশ্বাস করাই ছিল এই Evangelical Missionary-র একমাত্র লক্ষ্য এবং এ কারণে কেরী-সমর্থিত Evangelical Vernacularism তার অনুমোদন পায়নি। পাশ্চাত্য শিক্ষার কোনও বিকল্প আছে বলে তিনি মনে করতেন না। আর এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন মেকলে, যাকে হ্যাচার বলেছেন 'unapologetic imperialist'। মেকলেই ছিলেন ১৮৩৬-এর বিতর্কিত 'Minute of Indian Education'-এর রচয়িতা, যে দলিলটি প্রাচ্যবিদ্যার সমূহ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল। ডাফ এবং মেকলের শিক্ষানীতিতে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাই স্থান পেয়েছিল। তাদের Imperialist Anglicism -এর মধ্যে Evangelical Anglicism-এর লেশমাত্র খুঁজে পাওয়ার উপায় ছিল না।

Scanned with CamScanner

মাধ্যমেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হলে একাজ দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

১৭৮০ খ্রিঃ জেমস অগাস্টাস হিকি সাপ্তাহিক বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করেন, সরকারি কাজে দুর্নীতি প্রকাশে এই ইংরাজি সাপ্তাহিকটি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। কয়েক বছরের মধ্যে আরও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়—ইন্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, হরকরা। মাদ্রাজেও ইন্ডিয়া হেরাল্ড, মাদ্রাজ কেরিয়ার প্রকাশিত হয় (১৮১৯ খ্রিঃ)। বোম্বাই থেকেও বোম্বে হেরাল্ড, বোম্বে গেজেট প্রকাশিত হয়। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক দোষ তুলে ধরাই ছিল হিন্দু কলেজের ছাত্রদের 'পার্থেনান'-এর উদ্দেশ্য।

বাংলাভাষাতেও বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনারীদের দিগ্‌দর্শন এই সময় প্রকাশিত হয় (১৮১৮ খ্রিঃ), বাংলাতে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের বাংলা গেজেট ঐ সময়কার পত্রিকা, সমাচার দর্পণ, সংবাদ কৌমুদি (১৮২১ খ্রিঃ), সমাচার চন্দ্রিকা একই সময় প্রকাশিত হয়। এইসব পত্রিকা মারফৎ তদকালীন সমাজের চিত্র জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ খ্রিঃ ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ইয়ং বেঙ্গলের জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞান সেবধি ও অক্ষয় দত্তের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করা হয় (১৮৪৩ খ্রিঃ)। এইসব পত্রিকা বন্ধের জন্য যে আইন জারি হয় তা ১৮৩৫ খ্রিঃ প্রত্যাহৃত হয়। মহাবিদ্রোহের পূর্বে এইসব পত্রিকা স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের জাতীয় চেতনার উন্মেষে এদের দান অসীম।

Scanned with CamScanner

মে লণ্ডনের 'East Indian Association' এর সভাতে দাদাভাই নৌরজী বলেন, ভারতের দারিদ্র্যের জন্য 'Drain of wealth' বা আর্থিক নিষ্ক্রমণ নীতি দায়ী। রমেশচন্দ্র দত্ত ছাড়াও মদন মোহন মালব্য, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জি. সুব্রমনিয়া আয়ার প্রমুখরা ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করেন সম্পদ নির্গমন বা আর্থিক নিষ্ক্রমণের জন্য।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানী লাভের পর আর্থিক নিষ্ক্রমণ দেখা দেয়। কোম্পানীর শাসনের অবলুপ্তির পর ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই ক্ষতিপূরণের বোঝা ভারতবাসীর থেকে নেবার বন্দোবস্ত হল। ভারতে সরকারী বা বেসরকারী পদের ব্যক্তিদের বেতন, ভাতা, সঞ্চয় সমস্তই ইংল্যান্ডে চলে যেত। ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা যা লাভ করত তা ইংল্যান্ডে চলে যেত। এইভাবে বিভিন্নভাবে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে আর্থিক নিষ্ক্রমণ ঘটতে থাকে। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, আর্থিক নিষ্ক্রমণের ফলে ভারতে দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক দুর্বলতা ছাড়াও পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রেও অসুবিধা দেখা দেয়।

থিয়োডোর মরিসন 'The Economic Transition in India' গ্রন্থে এবং I. C. A. Knowles ও Vera Anstey 'Drain of wealth' এর তীব্র সমালোচনা করে বলেন ভারত থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণ ঘটলেও ভারতও বিনিময়ে অনেক কিছুই পেত। দাদাভাই নৌরজী সম্পদ নিষ্ক্রমণ তত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছেন ভারতকে এই সমস্যার সমাধান করতে হলে স্বশাসনের প্রয়োজন। তাঁর মতে, ভারত থেকে যে সম্পদ ইংল্যান্ডে চলে গেছে তা না গেলে ভারতের জাতীয় আয় অনেক বৃদ্ধি পেত। ইংরেজ লেখক থিওডোর মরিশন ও I. C. A. Knowles, ও Vera Anstey এর তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। সুতরাং দাদাভাই নৌরজী ও রমেশচন্দ্র দত্তের 'আর্থিক নিষ্ক্রমণ তত্ত্বের গুরুত্ব অবশ্যই ছিল। তাদের বক্তব্যের জোরালো দিকগুলি পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের ভাববার বিষয় হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

তিনি ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভর করেছিলেন 'to standardize and cultivate ... languages'-এর জন্য। এই দায়িত্ব পালনের জন্য কেরীর অকৃত্রিম চেষ্টা আবার তাঁকে একটা vernacularist-এ পরিণত করেছিল, সেবিষয়ে তাঁর সহকর্মী যেশুয়া মার্শম্যানের সন্দেহ ছিল না। কেরীর মধ্যে ভারতীয় ভাষার প্রতি প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের শ্রদ্ধা ছিল সুস্পষ্ট। সহকর্মী রামরাম বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে এ বিষয়ে সৃষ্টিশীল হতে তিনি ... করেন। আবার বাংলায় বাইবেলের অনুবাদ করে তিনি তাঁর Evangelical ... করেছিলেন।

'তবে প্রাচ্যপ্রেমীদের চেষ্টা সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রথমদিকে সরকারি শিক্ষানীতিতে ... ভারতীয় ভাষা যে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি, তা প্রমাণিত হয় ১৮১৩-র চার্টার অ্যাক্টে শিক্ষার ... বা উদ্দেশ্য অস্পষ্ট রাখার মধ্যে। কেরী ও তাঁর সহযোগীদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও, ... লিখেছেন, ১৮৩০-এর দশকে 'Vernacularism was virtually crushed beneath ... needs of Anglicist policies.' ১৮১৩-এর চার্টার অ্যাক্টে ভারতবর্ষে মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ... অনুমতি দেওয়া হয় এবং একইসঙ্গে ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার জন্য সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গ ... বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছিল। কিন্তু মিশনারী তৎপরতা ও শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগের এই ... সমাপতনিক ভাবা ভুল, কেননা ইভানজেলিক্যালরা ভারতে শিক্ষার প্রসার ছাড়া খ্রীষ্টধর্ম ... প্রচারের কথা ভাবতেই পারত না। অথচ সরকারি নীতি ছিল এদেশের ধর্মীয় ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ... না করা। গৌরী বিশ্বনাথন জানিয়েছেন সরকার এই সঙ্কট মোচনের পথ খুঁজে পেয়েছিল ... ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে। বিশ্বনাথনের ভাষায় "The tension be-tween increasing involvement in Indian Education and enforced non-interfer-ence in religion was productively resolved through the introduction of English Literature." তবে কোম্পানি সরকার শিক্ষার প্রসারের জন্য বার্ষিক যে ২ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল তা পরম্পরাগত ভারতীয় শিক্ষা বা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ... প্রসারের জন্য ব্যয় করা হবে, সেটা স্পষ্ট করে উল্লেখ না করায় যে অনিশ্চয়তা ও দ্বার্থকতা ... থেকে গিয়েছিল তার মধ্যেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাদের সংঘাতের মূল কারণটা খুঁজে পাওয়া যায়।

তবে কোম্পানির নীতির মধ্যে এমন কোনও ইঙ্গিত ছিল না যে তা ইংরেজি ভাষাকে ... শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম বলে মনে করত। অবশ্য শিক্ষা সম্প্রসারণে ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণীর ... আগ্রহ (রঞ্জিত গুহ যাকে বলেছেন, the big thrust) ছিল অনস্বীকার্য। শিক্ষাবিদ হিসাবে ... বিদ্যাসাগরের ভূমিকা গঠনে এই দৃষ্টিভঙ্গি সাহায্য করেছিল, কেননা 'improvement'-এর ... প্রেরণা তাঁকে ইতিমধ্যেই স্পর্শ করেছিল। Improver বা প্রাচ্যপ্রেমী বা পাশ্চাত্যশিক্ষা অনুরাগী ... Cosmopolitan অথবা Evangelical সেটা তাঁর কাছে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক এ তথ্য স্মর্তব্য যে ১৮১৩-এর চার্টার অ্যাক্টের নবীকরণের দশ বছর পরেও ... সরকার শিক্ষার মধ্য দিয়ে তার 'improvement'-এর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ... কিছুই করেনি। সরকার সম্ভবত আশা করেছিল যে, হিন্দু কলেজ (১৮১৭ খ্রিঃ), ক্যালকাটা স্কুল ... বুক সোসাইটি (১৮১৭ খ্রিঃ) বা 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র মতো স্বেচ্ছাসেবী ও সমবায় ... প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই এই প্রগতি সম্ভব হবে। ইংলন্ডের শিক্ষাব্যবস্থাও এই সময়ে ছিল বহুল ... পরিমাণে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান নির্ভর। তবে ভারতবর্ষে এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় ঘটনা ছিল গভর্নমেন্ট

Scanned with CamScanner